৫

মূলধন কাঠামো

Capital Structure

শুধুমাত্র নিজস্ব মূলধন দিয়ে ব্যবসা করা উচিত নয় বা প্রায়ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়। তাই ব্যবসা জগতে নিজস্ব মূলধনের পাশাপাশি ঋণের ব্যবহারও রয়েছে। ঋণ ছাড়াও আরও দু'ধরনের তহবিল ব্যবসায়ে ব্যবহার করা যায়। যেমন- অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন ও সংরক্ষিত আয়। বাস্তবে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ে এই চারটি উৎসের মধ্যে একটি সমন্বয় করে একটি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়। এটিকেই মূলধন কাঠামো বলা হয়। মূলধন কাঠামোটি অবশ্যই কাম্য হতে হবে। কাম্য মূলধন কাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানের মূল্য সর্বাধিকরণ সম্ভব। এই ইউনিটে প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : বৈশিষ্ট্য, মূলধন খরচ ও মূলধন কাঠামোর সম্পর্ক
পাঠ-৫.২ : মূলধন কাঠামো নির্ধারণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
পাঠ-৫.৩ : মূলধন কাঠামো ও আর্থিক লিভারেজ
পাঠ-৫.৪ : মূলধন কাঠামো তত্ত্ব
পাঠ-৫.৫ : নিট আয় তত্ত্ব
পাঠ-৫.৬ : নীট পরিচালনা আয় তত্ত্ব
পাঠ-৫.৭ : কাম্য মূলধন কাঠামো

পাঠ-৫.১ বৈশিষ্ট্য, মূলধন খরচ ও মূলধন কাঠামোর সম্পর্ক

Features, Relationship between Cost of Capital and Capital Structure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মূলধন কাঠামোর সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- সঠিক মূলধন কাঠামোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- মূলধন খরচ ও মূলধন কাঠামোর সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন ।

মূলধন কাঠামো (Capital Structure)

একটি কোম্পানি চারটি উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। উৎস চারটি হলো - ঋণ, সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ও সংরক্ষিত আয়। সাধারণত প্রায় প্রতিটি কোম্পানিতে বিভিন্ন অনুপাতে এই উৎসগুলোর একটা সমন্বয় থাকে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তহবিলের উৎস যেমন- ঋণপত্র, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন এবং সঞ্চিতি (reserve) ও উদ্বৃত্ত (সংরক্ষিত আয়) সহ সাধারণ শেয়ার মূলধনের সমন্বয় (composition) -কে মূলধন কাঠামো বা capital structure বলে। অনেক সময় এটিকে আর্থিক কাঠামো (financial structure) -ও বলা হয়। তবে, মূলধন কাঠামোর সাথে চলতি দেনা যুক্ত হলেই সেটি আর্থিক কাঠামোতে পরিণত হয়।

তহবিল ব্যবহারে মিতব্যয়ীতা অর্জনের জন্য একটি সঠিক মূলধন কাঠামো (appropriate capital structure) প্রয়োজন। এটিকে অবশ্যই একটি কাম্য কাঠামো হতে হবে। যে মূলধন কাঠামোতে মূলধন খরচ (cost of capital) সবচেয়ে কম হয় এবং যেটি ব্যবহারে শেয়ারের বাজার মূল্য সবচেয়ে বেশি হয় তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো (optimum capital structure) বলা হয়। যখন কোম্পানির তহবিলের উৎসগুলোর প্রান্তিক প্রকৃত খরচ (marginal real cost) একই হয়, তখন মূলধন খরচ সবচেয়ে কম এবং শেয়ারের বাজার মূল্য (market price) সবচেয়ে বেশি হয়।

তাত্ত্বিকভাবে একটি কাম্য মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করা যেমন সহজ বাস্তবে ঠিক তেমনি কঠিন। একটি শিল্পের অধীনে অনেকগুলো কোম্পানি থাকতে পারে। যেমন- পাট শিল্পের আওতায় পাটজাত পণ্যের অনেক কোম্পানি রয়েছে, বস্ত্রশিল্পের আওতায় অনেক বস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট শিল্পের আওতায় কোম্পানিগুলোর মূলধন কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এর মূল কারণ মূলধন কাঠামো কতিপয় প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন তাত্ত্বিক মডেল দ্বারা এই উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কারণ উপাদানগুলো উচ্চমাত্রায় মনস্তাত্ত্বিক, জটিল ও গুণগত। তাই এগুলো কোন তত্ত্ব মানে না। এর মূল কারণ হলো মূলধন বাজারে পূর্ণতা (perfection) থাকে না। তাই অনিশ্চয়তা ও অপূর্ণতার মধ্যেই মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মূলধন কাঠামো নির্ধারণের সময় সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের বিচার-বুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিচালক পর্ষদ বা আর্থিক ব্যবস্থাপকের কোম্পানির জন্য একটি সুবিধাজনক এবং সঠিক মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করা উচিত। মূলধন কাঠামোর উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান বা নির্ণায়কগুলোর যথার্থ বিশ্লেষণ করে এই কাজটি করা সম্ভব। ধরুন, আপনি একটি কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। তাহলে মূলধন কাঠামো পরিকল্পনা করার সময় আপনার উদ্দেশ্যটি কী হবে? শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থরক্ষা হয় এমন উদ্দেশ্য সামনে রেখে আপনাকে মূলধন কাঠামো গঠনের পরিকল্পনা করতে হবে। পরিচালকগণ মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেহেতু শেয়ারহোল্ডারদের ভোটে পরিচালকগণ নির্বাচিত হন তাই তাঁরা অবশ্যই শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থের প্রতি গুরুত্ব দিবেন। অন্যান্য পক্ষ যেমন- গ্রাহক, ঋণদাতা, সমাজ ও সরকারের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারটিও গুরুত্ব দিতে হবে। যখন কোন কোম্পানি মূলধন কাঠামো নির্ধারণে শেয়ারহোল্ডারদের কল্যাণের দিকে গুরুত্ব দেয় তখন অন্যান্য পক্ষের স্বার্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই রক্ষা হয়ে যায়।

সঠিক মূলধন কাঠামো নির্ধারণে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের লক্ষ্য থাকবে শেয়ারের দীর্ঘমেয়াদী বাজার মূল্য সর্বাধিক পর্যায়ে উন্নীত করা। তাত্ত্বিকভাবে, একটি নির্দিষ্ট পরিসরের (range) মধ্যে শেয়ারের বাজার মূল্য নির্ধারিত হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, একটি শিল্পের আওতায় একাধিক কোম্পানি থাকে। যদি কোম্পানিগুলো শিল্পের গড় মূলধন কাঠামোর সাথে সঙ্গতি রেখে একটি পরিসরের মধ্যে মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করে, তাহলে শেয়ারের বাজার মূল্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এই ধরনের মূলধন কাঠামো অভিজ্ঞতার আলোকে নিরূপণ করা যেতে পারে। ধরুন, একটি কোম্পানি যে শিল্পের আওতাভুক্ত সেই শিল্পের গড় ঋণ ও মূলধন অনুপাত (average debt equity ratio) ৭০%। এখানে অভিজ্ঞতার দ্বারা এমন প্রতীয়মান হতে পারে যে, শিল্পের গড় মূলধন কাঠামো থেকে ১০% পরিসরে মূলধন কাঠামো মেনে চললে শেয়ারহোল্ডারদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। এই অবস্থায় কোম্পানির মূলধন কাঠামোতে ঋণ এবং নিজস্ব মূলধনের যে অনুপাাত হবে, তার পরিসর (range) হবে (৭০% - ১০%) =৬০% এবং (৭০% + ১০%) = ৮০% এর মধ্যে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অবশ্যই শেয়ারমূল্য সর্বাধিক করার জন্য পরিসরের সর্বোচ্চ মানের কাছাকাছি মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করা উচিত। এক্ষেত্রে কোম্পানিকে অবশ্যই নমনীয়তা, স্বচ্ছলতা ইত্যাদির পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মূলধন নিয়ন্ত্রক ও শেয়ার বাজার কর্তৃক আরোপিত আদর্শ (norm) মেনে চলতে হবে।

এবার আসুন, একটি সঠিক মূলধন কাঠামোর কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। একটি সঠিক মূলধন কাঠামোর নিচের গুণাবলীগুলো থাকা প্রয়োজন।

১. লাভ-অর্জন ক্ষমতা (Profitability)

মূলধন কাঠামোটি কোম্পানি পারিচালনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে লাভজনক হতে হবে। এমন একটি মূলধন কাঠামো তৈরি করতে হবে যেখানে সবচেয়ে কম খরচে লিভারেজের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। খরচ কমলে লাভ বেশি হবে এবং লিভারেজের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হলে মূলধন কাঠামো লাভ-অর্জন ক্ষমতার গুণ অর্জন করবে।

২. স্বচ্ছলতা (Solvency)

কোম্পানি অতিমাত্রায় ঋণ ব্যবহার করলে তা কোম্পানির স্বচ্ছলতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। কারণ ঋণের টাকা মেয়াদপূর্তিতে ফেরত দিতে হয়। তাই নগদানের অভাবে সময়মত ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে কোম্পানি দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটি প্রতিষ্ঠানের এক ধরনের ঝুঁকি। এই ঝুঁকি পরিহার করা বা কমানো ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। ঋণ ব্যবহারে যদি অতিমাত্রায় ঝুঁকি বেড়ে যায়, তাহলে তা ব্যবহার করা উচিত নয়।

৩. নমনীয়তা (Flexibility)

মূলধন কাঠামো কখনই এমন হবে না যে, তা অবস্থা বিশেষে পরিবর্তন করা যাবে না। এটি অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। তাই কোম্পানি এমন একটি মূলধন কাঠামো তৈরি করবে যার ব্যবহার খরচ কম হয় এবং অবস্থা বিশেষে প্রয়োজনে দেরি না করে তা পরিবর্তন করা যায়। যদি সব তহবিল লাভজনক বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয় তখন এই কাজটি সহজে করা যায়।

৪. রক্ষণশীলতা (Conservatism)

মূলধন কাঠামো অবশ্যই রক্ষণশীল হবে অর্থাৎ কোম্পানির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। ভবিষ্যত নগদ প্রবাহের উপর ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা নির্ভর করে। কেননা এই নগদ প্রবাহ থেকেই কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

৫. নিয়ন্ত্রণ (Control)

কী ধরনের তহবিল কী পরিমাণে ব্যবহার করা হবে তা পরিকল্পনা করার জন্য বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীত দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হয়। ঋণদাতার ঋণচুক্তিতে বিশেষ শর্ত ছাড়া ব্যবস্থাপনায় কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। অনুরূপভাবে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণও প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে ঋণ ও অগ্রাধিকার যুক্ত শেয়ার মূলধন ব্যবহার করা হলে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হারাবার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু নতুন শেয়ার ইস্যু করা হলে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হারাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই বর্তমান

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সাধারণ শেয়ার মূলধনের চেয়ে ঋণ ও অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন বেশি পছন্দ করবে। তাই মূলধন কাঠামোতে ব্যবস্থাপনার কম নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

এগুলোই মূলতঃ মূলধন কাঠামোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন নির্দিষ্ট বা বিশেষ কোম্পানির ক্ষেত্রে আরো নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে পারে। এছাড়া উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিও বিভিন্ন কোম্পানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতে পারে। যেমন- একটি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে স্বচ্ছলতার উপর বেশি গুরুত্ব দিতে পারে। অবস্থা বিশেষে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর পরিবর্তন হতে পারে। তবে প্রত্যেক কোম্পানিই এমন একটি মূলধন কাঠামো অনুসরণ করবে যেটি সহজে গ্রহণযোগ্য ও সুবিধাজনক।

মূলধন খরচ এবং মূলধন কাঠামোর মধ্যে সম্পর্ক

কোম্পানির মূলধন কাঠামো নির্ধারণে মূলধন ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করা হলেই মূলধন খরচ প্রভাবিত হয়। মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করার সময় কোম্পানির দুইটি উদ্দেশ্য সামনে থাকে। একটি হলো শেয়ারের বাজার মূল্য সর্বাধিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং অপরটি হলো মূলধন খরচের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা। সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় যে, মূলধন কাঠামোর সাথে মূলধন ব্যয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

- ঋণ, সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ও সংরক্ষিত আয়ই কোম্পানির তহবিলের উৎস।
- দীর্ঘমেয়াদী ঋণ তহবিলের উৎসসমূহ যেমন- ঋণপত্র, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন এবং সঞ্চিতি (reserve) ও উদ্বৃত্ত (সংরক্ষিত আয়) সহ সাধারণ শেয়ার মূলধনের সমন্বয় (composition) কে মূলধন কাঠামো বা capital structure বলে।
- যে মূলধন কাঠামোতে মূলধন খরচ (cost of capital) সবচেয়ে কম হয় এবং শেয়ারের বাজার মূল্য সবচেয়ে বেশি হয়, তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো (optimum capital structure) বলা হয়।
- যখন তহবিলের উৎসগুলোর প্রান্তিক প্রকৃত খরচ (marginal real cost) একই হয় তখন মূলধন খরচ সবচেয়ে কম এবং শেয়ারের বাজার মূল্য (market price) সবচেয়ে বেশি হয়।
- সঠিক মূলধন কাঠামো নির্ধারণে একজন আর্থিক ব্যবস্থাপকের লক্ষ্য থাকবে শেয়ারের দীর্ঘ মেয়াদী বাজার মূল্য সর্বাধিক পর্যায়ে উন্নীত করা।
- লাভ-অর্জন ক্ষমতা, স্বচ্ছলতা, নমনীয়তা, রক্ষণশীলতা ও নিয়ন্ত্রণ সঠিক মূলধন কাঠামোর বৈশিষ্ট্য।
- মূলধন কাঠামো পরিবর্তিত হলেই মূলধন ব্যয় প্রভাবিত হয়।

পাঠ-৫.২ মূলধন কাঠামো নির্ধারণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
Factors Influencing Capital Structure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মূলধন কাঠামো নির্ধারণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলি উল্লেখ করতে পারবেন;
- মূলধন কাঠামো নির্ধারণে লিভারেজ ও মূলধন ব্যয় কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবেন;
- মূলধন কাঠামোর উপর কোম্পানির নগদ প্রবাহ সামর্থ, নিয়ন্ত্রণ ও নমনীয়তার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- মূলধন কাঠামো নির্ধারণে কোম্পানির আকার, বাজারজাতকরণ যোগ্যতা ও উত্তরণ খরচের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।

কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ নেওয়ার সময়ই একটি মূলধন কাঠামোর পরিকল্পনা করা হয়। প্রাথমিক মূলধন কাঠামোটি যত্নের সাথে ডিজাইন করতে হয়। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মূলধন কাঠামো তৈরি করতে হবে এবং পরবর্তীকালে এই লক্ষ্যমাত্রায় মূলধন কাঠামো অর্জনের জন্য অর্থায়ন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপককে চলতি মূলধন কাঠামো নিয়ে কাজ করতে হয়। কোম্পানির কার্যক্রম অব্যাহত গতিতে চলমান রাখার জন্য প্রতিনিয়ত ব্যবহারের জন্য তহবিল প্রয়োজন। একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক হিসাবে আপনাকে তহবিলের উৎসগুলোর খুঁটিনাটি বিশেগুষণ করে সুনির্দিষ্ট মূলধন কাঠামো অর্জনের উদ্দেশ্য সামনে রেখে সুবিধাজনক ও লাভজনক একটি উৎস নির্বাচন করে তহবিল সংগ্রহ করতে হবে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, একটি কোম্পানিতে নিয়মিত মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং যখনই তহবিল প্রয়োজন হয়, তখনই মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

যখন মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখনই সাধারণত নিচের উপাদানগুলো (factors) বিবেচনা করতে হয়-

১. শেয়ার প্রতি আয়ের উপর লিভারেজের প্রভাব (Leverage effect on EPS)
২. মূলধন ব্যয় (Cost of capital)
৩. কোম্পানির নগদ প্রবাহ সামর্থ (Cash flow ability of the company)
৪. নিয়ন্ত্রণ (Control)
৫. নমনীয়তা (Flexibility)
৬. কোম্পানির আকার (Size of the company)
৭. বাজারজাতকরণ যোগ্যতা (Marketability) এবং
৮. উত্তরণ খরচ (Floatation cost)

১. শেয়ার প্রতি আয়ের উপর লিভারেজের প্রভাব (Leverage effect on EPS)

ঋণের মাধ্যমে কোম্পানির সম্পদে অর্থায়ন করা হলে তাকে আর্থিক লিভারেজ বলা হয়। এরূপ সম্পদ ব্যবহারে আয় যদি ঋণের খরচ (cost of debt) অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে শেয়ার প্রতি আয় (earning per share, EPS) বৃদ্ধি পাবে। সম্পত্তি অর্জনে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ব্যবহার করা হলেও EPS বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঋণের মাধ্যমে লিভারেজের প্রভাব দু'টি কারণে ইতিবাচক; যথা (i) সাধারণত ঋণের খরচ (cost of debt) অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন খরচ (cost of preference share capital) এর চেয়ে কম ; (ii) ঋণের উপর প্রদত্ত সুদ করকর্তনযোগ্য।

EPS -এর উপর প্রভাব থাকার কারণে মূলধন কাঠামো পরিকল্পনায় আর্থিক লিভারেজের ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কোম্পানির সুদ ও কর প্রদানের পূর্ববর্তী মুনাফা (earning before tax and interest) -এর পরিমাণ যদি

বেশি থাকে, তাহলে লিভারেজের পরিমাণ বাড়িয়ে শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার প্রতি আয় বাড়ানো সম্ভব। নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন।

উদাহরণ

মনে করি, X Ltd. কোম্পানির প্রতি শেয়ার ১০টাকা করে ২,০০,০০০ সাধারণ শেয়ার আছে। কোম্পানিটি ৫,০০,০০০ টাকা অর্থায়ন করবে। তিনটি বিকল্প উৎসের কথা কল্পনা করি; উৎস তিনটি নিম্নরূপ:

(i) ৫০,০০০ সাধারণ শেয়ার ইস্যুকরণ;

(ii) ১০% সুদে ৫,০০,০০০ টাকা ঋণকরণ;

(iii) ১০% অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার, প্রতি শেয়ার ১০ টাকার ৫০,০০০টি শেয়ার ইস্যুকরণ;

X Ltd. -এর সুদ ও কর পূর্ববর্তী আয় (EBIT) ৩,০০,০০০ টাকা হলে তিনটি বিশুদ্ধ উৎসের EPS এর উপর প্রভাব দেখান। মনে করুন, কর হার ৫০%।

সমাধান

নিচে তিনটি বিকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্রে EPS -এর উপর প্রভাব দেখানো হলো ঃ

বিবরণ	নিজস্ব মূলধনের মাধ্যমে অর্থায়ন	ঋণ অর্থায়ন	অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়ন
EBIT	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০	৩,০০,০০০
বাদ, সুদ	-	৫০,০০০	-
EAIBT	৩,০০,০০০	২,৫০,০০০	৩,০০,০০০
বাদ, কর ৫০%	১,৫০,০০০	১,২৫,০০০	১,৫০,০০০
EAT	১,৫০,০০০	১,২৫,০০০	১,৫০,০০০
বাদ, অগ্রাধিকার লভ্যাংশ	-	-	৫০,০০০
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টনযোগ্য আয়	১,৫০,০০০	১,২৫,০০০	১,০০,০০০
শেয়ারের সংখ্যা	২,৫০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
EPS	০.৬০	০.৬৭৫	০.৫০

উপরের উদাহরণে দেখতে পাচ্ছেন, ঋণ অর্থায়নের ফলে EPS -এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অগ্রাধিকারযুক্ত লভ্যাংশ এবং ঋণের সুদের হার এক হওয়া সত্ত্বেও শেয়ার প্রতি আয় (EPS) কিন্তু ঋণ অর্থায়নের বিকল্পটিতে বেশি। এর মূল কারণ কি? মূল কারণ হলো সুদ কর কর্তনযোগ্য, কিন্তু লভ্যাংশ কর কর্তনযোগ্য নয়। উচ্চ মাত্রার লিভারেজের সাথে EBIT বৃদ্ধি করলে EPS বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি সম্পত্তি ব্যবহার করে ঋণের সুদের চেয়ে আয় হার (rate of return) বৃদ্ধি করা না যায়, তাহলে লিভারেজের ব্যবহার EPS -এর উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এবার নিচের উদাহরণটি লক্ষ্য করুন :

বিবরণ	নিজস্ব মূলধনের মাধ্যমে অর্থায়ন	ঋণ অর্থায়ন	অগ্রধিকারযুক্ত শেয়ারের মাধ্যমে অর্থায়ন
EBIT	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
বাদ, সুদ	-	৫০,০০০	-
EAIBT	২,০০,০০০	১,৫০,০০০	২,০০,০০০
বাদ, কর ৫০%	১,০০,০০০	৭৫,০০০	১,০০,০০০
EAT	১,০০,০০০	৭৫,০০০	১,০০,০০০
বাদ, অগ্রাধিকার লভ্যাংশ	-	-	৫০,০০০
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টনযোগ্য আয়	১,০০,০০০	৭৫,০০০	৫০,০০০
শেয়ারের সংখ্যা	২,৫০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
EPS	০.৪০	০.৩৭৫	০.২৫

উপরের উদাহরণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, আয় হার (rate of return) যদি ঋণের খরচ (cost of debt) বা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন খরচ (cost of preference share capital) -এর চেয়ে কম হয় তাহলে EPS কমে যাবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপকের জন্য EBIT - EPS বিশ্লেষণ মূলধন কাঠামো ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র (tool) হিসেবে কাজ করে। এই ধরনের বিশ্লেষণে আপনি EBIT -এর সম্ভাব্য পরিবর্তন বিবেচনা করতে পারেন এবং EPS-এর উপর বিভিন্ন বিকল্প অর্থায়নের প্রভাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন।

যদি সম্ভাব্য আয়ের হার ঋণের খরচের চেয়ে সামান্য কম হয় তাহলে কোম্পানি ঋণ ব্যবহার করে EPS বাড়াতে পারে এবং এটি শেয়ারের বাজার মূল্যে প্রভাব ফেলবে। আবার যদি সম্ভাব্য আয় হার ঋণের খরচের চেয়ে খুব কম হয়, তাহলে কোম্পানির ঋণ মূলধন ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়।

কোম্পানির কার্যক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে EPS -এর ব্যবহার খুব ব্যাপক। অবশ্য EPS -এর মাধ্যমে মূল্যায়নের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন উপরের উদাহরণের কথাই ধরুন, সবচেয়ে বেশি EPS যদি কোম্পানির উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কোম্পানি ঋণ গ্রহণের উচ্চ স্তরটি নির্ধারণের পরিকল্পনা করে। প্রায় ক্ষেত্রেই EPS নির্ণায়ক হিসাবে ঋণ ব্যবহারের অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে। কর-পরবর্তী ঋণ খরচ আয় হারের চেয়ে কম হলে এবং EBIT ধ্রুব থাকলে লিভারেজ বাড়ানোর সাথে সাথে EPS বাড়বে। আবার কর-পরবর্তী ঋণ খরচ (after tax borrowing cost) আয় হারের চেয়ে বেশি হলে এবং EBIT ধ্রুব থাকলে লিভারেজ বাড়ালে EPS কমে যায়। EPS নির্ণায়কটি ঝুঁকির বিষয় বিবেচনা করে না। এটি EPS -এর সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। এটি EPS -এর প্রত্যাশিত মূল্যের পরিবর্তনশীলতা বিবেচনা করে না। কিন্তু বিনিয়োগকারীগণ শেয়ার মূল্যায়নের সময় প্রত্যাশিত মূল্য এবং পরিবর্তনশীলতা (variability) উভয়ই বিবেচনা করে।

লিভারেজের সাথে জড়িত ঝুঁকিকে আর্থিক ঝুঁকি বলা হয়। ঋণ বাড়ানোর সাথে সাথে আর্থিক ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। কারণ (i) ঋণ বৃদ্ধি পেলে শেয়ারহোল্ডারদের আয়ের পরিবর্তনশীলতা (variability) বৃদ্ধি পায় (ii) দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। আপনি হয়ত মূলধন কাঠামোতে ঋণ ব্যবহার না করে আর্থিক ঝুঁকি পরিহার করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণ EPS -এর প্রত্যাশিত বৃদ্ধির সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই এমন পরিমাণ ঋণ ব্যবহার করতে হবে যাতে EPS -এর প্রত্যাশিত বৃদ্ধির ফলে যে সুবিধা পাওয়া যায় তার চেয়ে আর্থিক ঝুঁকি বেশি না হয়। কোম্পানি ঋণ ব্যবহারের একটি সীমা অতিক্রম করলে প্রত্যাশিত EPS ক্রমাগত বাড়বে কিন্তু অতিরিক্ত ঝুঁকির কারণে মূলধন খরচও বাড়বে বা কোম্পানির মূল্য হ্রাস পাবে।

EPS নির্ণায়কটি অর্থায়ন সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদী বিষয় বিবেচনা করে না। এছাড়া এটি ঝুঁকি আয় সমন্বয় (risk-return trade-off) নীতি অনুসরণ করে না। দীর্ঘমেয়াদে অর্থায়ন সিদ্ধান্তে EPS সর্বাধিকরণের চেয়ে সম্পদ সর্বাধিকরণের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। সুতরাং এটি কার্যক্রম পরিমাপের মানদন্ড হলেও অর্থায়ন সিদ্ধান্তে মানদন্ড (criteria) হিসাবে গণ্য করা যায় না।

তাই বলে চট করে বলে দেওয়া যাবে না যে, অর্থায়ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে EPS -এর ব্যাপারটি সম্পূর্ণ পরিহার করা উচিত। মনে রাখবেন, EPS কোম্পানির কার্যক্রম পরিমাপের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং বিনিয়োগকারীগণ এর উপর তাঁদের বিনিয়োগের জন্য বিশেষভাবে নির্ভর করেন। বিনিয়োগকারীগণ কোম্পানির ভবিষ্যত আয় এবং নগদ প্রবাহ সম্পর্কে কোন তথ্য পান না; তাই তাঁরা তাঁদের বিনিয়োগ মূল্যায়নের জন্য অতীত তথ্যগুলোকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেন।

বিকল্প অর্থায়ন থেকে কোন একটি নির্বাচন করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অবশ্যই EPS এর উপর প্রভাব বিবেচনা করা উচিত। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এতে যেন শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ প্রাধান্য পায়। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যদি প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদী মূল্য বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে সাময়িকভাবে EPS -এ প্রতিকূল প্রভাব পড়বে। তাই এই বিষয়টি শেয়ারহোল্ডারদের জানিয়ে রাখা ভাল। অন্যথায় ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকে।

২. মূলধন খরচ (Cost of capital)

কোম্পানি ঋণ, সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার এবং সংরক্ষিত আয় -এই চারটি উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করে। এই উৎসগুলোর তহবিল সরবরাহকারীগণ সর্বনিম্ন যে পরিমাণ আয় প্রত্যাশা করেন সেটিই মূলতঃ অর্থায়ন উৎসের খরচ (cost of source of finance)। প্রত্যাশিত আয় তাঁদের কল্পিত ঝুঁকির মাত্রার উপর নির্ভর করে। যেমন- একজন ঋণদাতা যখন ঋণ দেন তখন তিনি সুদ দাবী করেন এবং ঋণ ফেরত না পাওয়ার ঝুঁকি থাকলে তিনি সুদের হার বাড়িয়ে দিবেন।

ঋণদাতার চেয়ে শেয়ারহোল্ডারদের ঝুঁকি বেশি। কারণ কোম্পানি লাভ করুক বা না করুক ঋণদাতা তাঁর সুদ পাবেনই। কিন্তু শেয়ারহোল্ডার লাভ হলে লভ্যাংশ পাবেন অন্যথায় পাবেন না। চূড়ান্ত ক্ষতির খেসারত তাঁকেই বহন করতে হয়। চুক্তি অনুযায়ী ঋণের মূল টাকা ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু শেয়ারহোল্ডারগণ টাকা ফেরত পায় না। তবে শেয়ার বিক্রয় করতে পারেন। কর কর্তনযোগ্য বিধায় কোম্পানির কাছে ঋণের খরচ আরো কমে যায়। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন সাধারণ শেয়ার মূলধনের চেয়ে কম খরচযুক্ত ; কিন্তু তাই বলে ঋণের চেয়ে কম নয়। মূলধন ব্যয় কম হওয়ার কারণে একটি কোম্পানি সর্বদা ঋণের অর্থ বেশি পছন্দ করে। ঋণ মূলধন কাঠামোর একটি উপাদান মাত্র। এটি সামগ্রিক ইস্যু বিবেচনা করে না।

মূলধন কাঠামোর সামগ্রিক খরচ সর্বনিম্ন করার বিষয় বিবেচনা করে অর্থায়ন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের মূল্য সর্বোচ্চ হবে। এটি স্বীকার করতে হবে যে, একটি কোম্পানি ক্রমাগত ঋণ ব্যবহার করে মূলধন খরচ কমাতে পারে না। এতে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের ফলে শেয়ারহোল্ডার ও ঋণদাতা উভয়েরই ঝুঁকি বেড়ে যায়। যখন কোম্পানি ক্রমাগত ঋণের অর্থ গ্রহণ করতে থাকে, তখন ঋণদাতা ঝুঁকির কথা চিন্তা করে সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে মূলধন খরচ (cost of capital) বেড়ে যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় ঋণ গ্রহণ শেয়ারহোল্ডারদের ঝুঁকি বাড়ায়। ফলে সাধারণ শেয়ার মূলধনের খরচ

(cost of equity) বেড়ে যায়। এটি অবশ্য একটি নির্দিষ্ট সীমার পর হয়ে থাকে। তাই ঋণ গ্রহণের এমন একটি পর্যায় থাকবে যেখানে মূলধনের গড় খরচ সবচেয়ে কম হয় বা প্রতিষ্ঠানের মূল্য সবচেয়ে বেশি হয়। সুতরাং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে একটি কোম্পানি মূলধন কাঠামোর পরিসর নির্ণয় করবে এবং এই পরিসরে নিরাপদে সেটির ব্যবহার নিশ্চিত করে মূল্য সর্বাধিক করতে পারে। ইক্যুইটি মূলধন (equity capital) -এর খরচের মধ্যে নতুন শেয়ারের খরচ (cost of new shares) এবং সংরক্ষিত আয়ের খরচ (cost of retained earnings) থাকে। এই দুই ধরনের উৎসের খরচের চেয়ে ঋণের খরচ কম। আবার নতুন ইস্যুকৃত শেয়ার মূলধনের খরচ অপেক্ষা সংরক্ষিত আয়ের খরচ কম। কেননা বন্টিত আয়ের উপর শেয়ারহোল্ডারদের কর দিতে হয় কিন্তু অবন্টিত বা সংরক্ষিত আয়ের উপর কোন কর দিতে হয় না। এছাড়া সংরক্ষিত আয়ের ক্ষেত্রে কোন উত্তরণ খরচ (floatation cost) নেই। তাই নিজস্ব তহবিলের দু'টি উৎসের মধ্যে সংরক্ষিত আয় বেশি পছন্দনীয়। মাত্রাতিরিক্ত ঋণ ব্যবহারের কারণে ইক্যুইটি মূলধন খরচ বাড়ে, ফলে শেয়ারহোল্ডারদের EPS বৃদ্ধি পেলেও সামগ্রিক আয় কমে যায়। লভ্যাংশ এবং শেয়ারের ভবিষ্যত মূল্যের বৃদ্ধিই শেয়ারের আয় তৈরি করে, EPS নয়। তাই EPS -এর চেয়ে শেয়ারের মূল্যের বিষয় বিবেচনা করে ঋণ - মূলধন অনুপাত (debt - equity ratio) নির্ধারণ করা উচিত।

সুতরাং এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, মূলধন ব্যয় (cost of capital) এবং EPS এর মধ্যে সমন্বয় সাধন (Trade off) ঋণ ব্যবহারের একটি সর্বোচ্চ পর্যায় সীমাবদ্ধ করে দেয়।

৩. নগদ প্রবাহ সামর্থ (Cash flow ability)

আমরা জানি, মূলধন কাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এটি রক্ষণশীল। এর মানে এই নয় যে, প্রতিষ্ঠান কোন ঋণ ব্যবহার করবে না বা সামান্য পরিমাণ ঋণ ব্যবহার করবে। মূলধন কাঠামোতে ব্যবহৃত ঋণ বা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের স্থায়ী চার্জ (fixed charge) এবং এই চার্জ পূরণ করার জন্য নগদ প্রবাহ ক্ষমতার সাথে রক্ষণশীলতা সম্পৃক্ত। একটি প্রতিষ্ঠানকে তখনই বলব এটি রক্ষণশীলভাবে অর্থায়ন করেছে, যখন এটি স্থায়ী চার্জ পূরণ করতে সমর্থ। স্থায়ী চার্জ হলো সুদ, অগ্রাধিকারযুক্ত লভ্যাংশ এবং ঋণ ও অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূল অর্থ।

যখন একটি কোম্পানি নতুন ঋণ নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করে তখন কোম্পানিটিকে অবশ্যই ভবিষ্যত নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ করতে হবে। কেননা ভবিষ্যতে নগদানের অভাবে দেউলিয়াত্বের খেসারত দিতে হবে। যে কোম্পানির ভবিষ্যত নগদ প্রবাহ ভাল সেটি মূলধন কাঠামোতে বেশি ঋণ ব্যবহার করতে পারে। যে কোম্পানির ভবিষ্যত নগদ প্রবাহ অস্থায়ী এবং অনুমানযোগ্য নয় সেটির মূলধন কাঠামোতে বেশি ঋণ ব্যবহার করা উচিত নয়।

নীট নগদ অন্তঃপ্রবাহের সাথে স্থায়ী চার্জের অনুপাত (net cash inflow to fixed charge) বিশ্লেষণ করে মূলধন কাঠামো পরিকল্পনা করা উচিত। কেননা এই অনুপাতটি থেকে নীট নগদ প্রবাহ থেকে কতবার দেনা পরিশোধ করা যাবে তা নির্ণয় করা যায়। অনুপাত বড় হলে বুঝতে হবে বেশি দেনা পরিশোধ করা যাবে এবং ঋণের ব্যবহার বাড়ানো যাবে।

নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ থেকে পরিস্কার যে, ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত বড় হলেও প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি স্থায়ী দেনা পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত নগদানের অন্তঃপ্রবাহ বজায় থাকে তাহলে সেটি কোন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এই ক্ষেত্রে নগদ প্রবাহ অসামর্থই মূলতঃ আর্থিক ঝুঁকি; ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাত কোন ঝুঁকি নয়।

৪. নিয়ন্ত্রণ (Control)

কোম্পানির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ পরিচালনা পর্ষদ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখার চেষ্টা করবে। কোম্পানির অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে তাঁরা ঋণ বা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের উপর বেশি গুরুত্ব দিবে। কেননা ঋণ দাতা এবং অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারহোল্ডারদের পরিচালক নির্বাচনে ভোটাধিকার নেই। সুতরাং ঋণ বা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ব্যবহারে তাদের নিয়ন্ত্রণ খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি নতুন সাধারণ শেয়ার ইস্যু করে অর্থায়ন করা হয় তাহলে পরিচালকদের নিয়ন্ত্রণ খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের পরিচালক নির্বাচনে ভোটাধিকার থাকে। যে সকল কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা প্রচুর (widely held company) সেই সকল কোম্পানিতে নতুন শেয়ার ইস্যু করা

হলে নিয়ন্ত্রণে তেমন কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে সকল কোম্পানিতে শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা সীমিত (closely held company) সেই সকল কোম্পানিতে নতুন শেয়ার ইস্যু করে অর্থায়ন করা হলে নিয়ন্ত্রণে প্রভাব পরে।

৫. নমনীয়তা (Flexibility)

মূলধন কাঠামো পরিকল্পনায় নমনীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এখানে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করার সামর্থকেই নমনীয়তা বলা হবে। কোন লাভজনক খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূলধন কাঠামো অবশ্যই পরিবর্তনযোগ্য হতে হবে। মূলধন কাঠামোর উপাদানগুলোর সম্ভাব্য পরিবর্তনের জন্য এর নমনীয়তা পরিকল্পনা করতে হবে। অর্থাৎ তহবিলের লাভজনক ব্যবহারের জন্য এক ধরনের অর্থায়ন থেকে অন্য ধরনের অর্থায়নে পরিবর্তনের নমনীয়তা থাকতে হবে। মূলধন কাঠামোর নমনীয়তার মাত্রা নিচের বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে-

১. স্থায়ী চার্জের নমনীয়তা; ২. ঋণ চুক্তির শর্তাবলী; ৩. অবসায়নের (redemption) শর্তাবলী; ও ৪. ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা।

কোম্পানি সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার ইস্যু করে বা ঋণ করে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। এই উৎসগুলো লভ্যাংশ বা সুদের সাপেক্ষে পরস্পর থেকে পৃথক। যেমন- ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার স্থির এবং মেয়াদ পুর্তিতে আসল সহ পরিশোধ করতে হয়। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মালিকদের লভ্যাংশ দেওয়ার পর সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ দেওয়া হয়। আবার ঋণের ক্ষেত্রে কোম্পানি লাভ করুক আর না করুক, আসল ও সুদ বাধ্যতামূলকভাবে পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু সাধারণ শেয়ারের অর্থ কখনই ফেরত দিতে হয় না। তবে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের অর্থ শর্ত সাপেক্ষে ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের লভ্যাংশ স্থির কিন্তু সাধারণ শেয়ারের লভ্যাংশ স্থির নয়। সুতরাং একটি কোম্পানি মূলধন কাঠামোতে ঋণের চেয়ে বেশি পরিমাণ ইক্যুইটি মূলধন অন্তর্ভুক্ত করে রক্ষণশীলতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু রক্ষণশীলতা অর্জন করা হলেও বহিঃ অর্থায়ন বা লিভারেজ অর্থায়নের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। তাই মূলধন কাঠামোতে ঋণ ও ইক্যুইটির মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ চুক্তিতে নানাবিধ শর্ত আরোপ করা হয়। এই শর্তগুলো নমনীয়তার ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে। এই শর্তগুলো নগদ লভ্যাংশ প্রদান, সম্পত্তি ক্রয় এবং অতিরিক্ত বহিঃঅর্থসংস্থানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে।

ঋণ ও অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার যদি কোম্পানির বিবেচনা অনুযায়ী অবসায়ন করা যায় তাহলে মূলধন কাঠামোতে যথেষ্ঠ নমনীয়তা আনা যায়। কেননা এতে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কোন কোন উৎস অবসায়ন করতে পারে, আবার অন্য কোন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। কোম্পানির হাতে প্রত্যাশিত পরিমাণের চেয়ে নগদ প্রবাহ বেশি থাকলে এবং লাভজনক বিনিয়োগ সুযোগ হাতে না থাকলে ঋণের অর্থ ফেরত দেওয়া উচিত। যদি অনুরূপ কাজটি করা না যায় তাহলে কিস্তিতে ফেরত দেওয়া উচিত। কারণ এতে সুদ বাবদ খরচের পরিমাণ কম হবে।

কোম্পানির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতার উপর মূলধন কাঠামোর নমনীয়তা নির্ভর করে। ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা বেশি হলে মূলধন কাঠামোর নমনীয়তাও বেশি হবে। কোন কোম্পানি সামর্থ সীমার বাইরে ঋণ করলে নমনীয়তার সুবিধা হারাবে। কেননা দুর্দিনে এবং প্রতিকূল অবস্থায় সহজ শর্তে ঋণ করতে সমর্থ হবে না।

মূলধন কাঠামোর নমনীয়তা বাঞ্ছনীয় হলেও এটি অর্জনের জন্য মূল্য দিতে হয়। সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার জন্য বেশি সুদ দিতে হয়। সুতরাং কোম্পানিকে সুবিধা ও খরচের মধ্যে তুলনা করে একটি কাঙ্খিত নমনীয়তার মাত্রা স্থির করতে হবে।

৬. কোম্পানির আকার (Size of the company)

বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে সুবিধা অসুবিধা কোম্পানির আকারের উপরও নির্ভর করে। যেমন- ক্ষুদ্র কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণের সময় ক্ষুদ্র কোম্পানিকে বেশি সুদ দিতে হয়। এ ছাড়া ঋণের চুক্তিপত্রে নানাবিধ শর্ত আরোপ করা হয়। শর্তগুলো মূলধন কাঠামোকে অনমনীয় করে ফেলে এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। সে কারণে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার মূলধন এবং সংরক্ষিত আয়ই দীর্ঘমেয়াদী তহবিলের উৎস। বৃহৎ কোম্পানি সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারে এবং

সাধারণ শেয়ার বা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বা ঋণপত্র ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। বেশি পরিমাণে ইস্যু করার ফলে ক্ষুদ্র কোম্পানির তুলনায় বৃহৎ কোম্পানির তহবিল খরচ কম হয়।

৭. বাজারজাতকরণ যোগ্যতা (Marketability)

একটি কোম্পানির শেয়ার পরবর্তী পর্যায়ে সেকেন্ডারি বাজারে (stock exchange) ক্রয় -বিক্রয় হয়। এই বাজারে শেয়ারের ক্রয় -বিক্রয় বেশি হলে শেয়ারের বাজারজাতকরণ যোগ্যতা আছে বলে ধরা হবে। ফলে কোম্পানি নতুন শেয়ার ইস্যু করে সহজে ইক্যুইটি তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। এছাড়া বাজারে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিক্রিয়া বিচার বিশ্লেষণ করে কোম্পানি ঋণপত্র ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

কোম্পানির নিজস্ব শেয়ারের বাজার খারাপ হলে সাধারণ শেয়ার ইস্যু করা উচিত নয়, তবে ঋণপত্র ইস্যু করা উচিত হবে। কোম্পানির অভ্যন্তরীণ অবস্থা শেয়ার বাজারে প্রতিফলিত হলে তহবিল সংগ্রহকরণ প্রভাবিত হয়। যেমন- উচ্চমাত্রার লিভারেজ সম্পন্ন কোম্পানির অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়।

৮. উত্তরণ খরচ (Floatation cost)

এটি মূলধন কাঠামোতে তেমন প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নয়। তহবিল সংগ্রহ করার সময় এই খরচ হয়ে থাকে। ঋণের উত্তরণ খরচ সাধারণ শেয়ারের উত্তরণ খরচের চেয়ে কম। সুতরাং এটি কোন কোম্পানিকে সাধারণ শেয়ারের চেয়ে ঋণের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারে। সংরক্ষিত আয় থেকে তহবিল সংগ্রহ করার জন্য উত্তরণ খরচ নির্বাহ করা হয় না। ছোট কোম্পানির উত্তরণ খরচ তুলনামূলকভাবে বড় কোম্পানির চেয়ে বেশি। কারণ তহবিলের পরিমাণ বেশি হলে উত্তরণ খরচের হার কম হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উত্তরণ খরচও মূলধন কাঠামোকে প্রভাবিত করে।

সারসংক্ষেপ :

- একটি কোম্পানিতে নিয়মিত মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং যখনই তহবিল প্রয়োজন হয়, তখনই মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
- EPS -এর উপর প্রভাব থাকার কারণে মূলধন কাঠামো পরিকল্পনায় আর্থিক লিভারেজের ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।
- ঋণদাতার চেয়ে শেয়ারহোল্ডারদের ঝুঁকি বেশি।
- অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন সাধারণ শেয়ার মূলধনের চেয়ে কম খরচযুক্ত।
- ঋণ গ্রহণের এমন একটি পর্যায় থাকবে যেখানে মূলধনের গড় খরচ সবচেয়ে কম হয় বা প্রতিষ্ঠানের মূল্য সবচেয়ে বেশি হয়।
- কোম্পানির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতা বেশি হলে মূলধন কাঠামোর নমনীয়তাও বেশি হবে।
- বৃহৎ কোম্পানি সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারে এবং সাধারণ শেয়ার বা অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার বা ঋণপত্র ইস্যু করে দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সংগ্রহ করতে পারে।

পাঠ-৫.৩ মূলধন কাঠামো ও আর্থিক লিভারেজ
Capital Structure and Financial Leverage

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আর্থিক লিভারেজ কী তা বলতে পারবেন; এবং
- আর্থিক বা মূলধন কাঠামো ও আর্থিক লিভারেজের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

আর্থিক লিভারেজে (Financial Leverage)

একটি প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস ব্যবহার করতে পারে। উৎসগুলো হতে পারে ঋণ বা অগ্রাধিকারযুক্ত মূলধন বা ইক্যুইটি মূলধন বা সংরক্ষিত আয়। প্রতিটি উৎসের খরচ ভিন্ন ভিন্ন। ঋণের খরচ স্থায়ী (fixed)। কেননা প্রতিষ্ঠান লাভ করুক আর না করুক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করতেই হবে। আবার অগ্রাধিকার লভ্যাংশ স্থায়ী হলেও এটি প্রদানের ব্যাপারটি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের উপর। কিন্তু সাধারণ শেয়ারের খরচ স্থায়ী নয়। কারণ লাভ হলেই সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ দেওয়া হয়। এটি অবশ্য লভ্যাংশ নীতির উপরও নির্ভর করে।

উপরের আলোচনায় এটি স্পষ্ট যে, মূলধন বা আর্থিক কাঠামোতে সাধারণ শেয়ার মূলধনের সাথে স্থায়ী ব্যয় বা চার্জের তহবিল, যেমন- ঋণ ও অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধন ব্যবহার করা হয়। আর মূলধন কাঠামোতে স্থায়ী চার্জের তহবিল ব্যবহারই আর্থিক লিভারেজ। স্থায়ী চার্জের কারণে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এই ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণে শেয়ারহোল্ডারদের আয় প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব প্রতিকূল ও অনুকূল উভয়ই হতে পারে। অর্থায়নের সাথে জড়িত বিধায় এটিকে আর্থিক লিভারেজ বলা হয়।

মূলধন কাঠামোতে লিভারেজ ব্যবহারের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো শেয়ারহোল্ডারদের আয় বাড়ানো। ঋণ ব্যবহারে যে খরচ হয় আয় হার (rate of return) তার চেয়ে বেশি হয়। ফলে শেয়ার প্রতি আয় (earning per share, EPS) সাধারণত বৃদ্ধি পায়। এটি লিভারেজের অনুকূল প্রভাব। যদি ঋণ ব্যবহারে যে খরচ হয় আয় হার তার চেয়ে কম হয় তাহলে লিভারেজের প্রভাব হবে প্রতিকূল। এবার আসুন নিচে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি।

ধরুন, ক ও খ দু'টি সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান। পার্থক্য শুধু খ প্রতিষ্ঠানটি মূলধন কাঠামোতে লিভারেজ ব্যবহার করেছে। আমরা নিচের তথ্য ব্যবহার করে লিভারেজের অনুকূল ও প্রতিকূল প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।

	ক প্রতিষ্ঠান	খ প্রতিষ্ঠান
সম্পত্তি	৳৫০,০০০	৳৫০,০০০
ঋণ (৯% ঋণপত্র)	০	২৫,০০০
সাধারণ শেয়ার মূলধন	৫০,০০০	২৫,০০০
শেয়ারের সংখ্যা	৫,০০০	২,৫০০
সম্পত্তির উপর কর পূর্ব আয়	২০%	২০%
কর হার	৫০%	৫০%

টেবিল: লিভারেজের অনুকূল প্রভাব

	ক প্রতিষ্ঠান	খ প্রতিষ্ঠান
EBIT @ ২০%	১০,০০০	১০,০০০
বাদ: সুদ (ঋণের উপর ৯% হারে)	০	২,২৫০
EAIBT	১০,০০০	৭,৭৫০
বাদ: কর ৫০%	৫,০০০	৩,৮৭৫
EAIT	৫,০০০	৩,৮৭৫
শেয়ারের সংখ্যা	৫,০০০	২,৫০০
শেয়ার প্রতি আয়, EPS	৳১.০০	৳১.৫৫

উপরের টেবিলে ক প্রতিষ্ঠানের EPS =৳১.০০ এবং খ প্রতিষ্ঠানের EPS =৳১.৫৫। দু'টি প্রতিষ্ঠানের আয় হার এক হওয়া সত্ত্বেও খ প্রতিষ্ঠানের EPS বেশি। এর দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত, প্রতিষ্ঠানটি আয় হারের চেয়ে কম খরচে ঋণ গ্রহণ করতে পেরেছে। যেমন- সুদ দিয়েছে ৯% কিন্তু আয় করেছে ২০%। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো ২০% -৯% = ১১%। ফলে ক ও খ প্রতিষ্ঠান দুটির মধ্যে কর-পূর্ব আয় ২,৭৫০ টাকা এবং কর পরবর্তী আয় ১,৩৭৫ টাকা পার্থক্য হয়েছে, যা নিচে আলোচনা করা হলো-

ঋণ ব্যবহারে সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় = ৳৫,০০০
(২৫,০০০ টাকার উপর ২০%হারে)
বাদ, সুদ (২৫,০০০ টাকার উপর ৯% হারে) ২,২৫০
লিভারেজের অনুকূল প্রভাব (কর পূর্ব) ৳২,৭৫০
(২৫,০০০ @ ১১%)
বাদ, কর @ ৫০% ১,৩৭৫
লিভারেজের অনুকূল প্রভাব (কর পরবর্তী) ৳১,৩৭৫

দ্বিতীয়ত, খ প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ২,৫০০ শেয়ার বিক্রয় করেছে। অপরদিকে ক প্রতিষ্ঠানটি ৫,০০০ শেয়ার বিক্রয় করেছে। খ প্রতিষ্ঠানটি অবশিষ্ট অর্থ ৯% ঋণপত্র ইস্যু করে সংগ্রহ করেছে। ফলশ্রুতিতে লিভারেজের অনুকূল প্রভাব, ৳২,৭৫০ (কর পূর্ব) এবং ৳১,৩৭৫ (কর পরবর্তী) ২,৫০০ শেয়ারের মধ্যে বন্টিত হয়েছে এবং ০.৫৫ টাকা EPS বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে EPS বাড়ানোর ক্ষেত্রে লিভারেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র বিশেষ। ফলে প্রতিষ্ঠান মূলধন কাঠামোতে ঋণের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী থাকে। অনেক সময় লিভারেজের কারণে প্রতিষ্ঠানের আয় হার মূলধন খরচের চেয়ে কম হতে পারে। এই অবস্থায় লিভারেজের প্রভাব ঋণাত্মক বা নেতিবাচক হবে। ফলে EPS কমে যাবে।

উপর্যুক্ত তথ্যগুলো অপরিবর্তিত রেখে আয় হার ৬% ধরে নিয়ে নিম্ন উপায়ে EPS নির্ণয় করা যায়-

	ক প্রতিষ্ঠান	খ প্রতিষ্ঠান
EBIT (৫০,০০০ টাকার ৬%)	৩,০০০	৩,০০০
বাদ: সুদ	০	২,২৫০
EABIT	৩,০০০	৭৫০

বাদ: কর ৫০%	১,৫০০	৩৭৫
EAIT	১,৫০০	৩৭৫
শেয়ারের সংখ্যা	৫,০০০	২,৫০০
EPS	০.৩০	০.১৫

টেবিল থেকে স্পষ্ট যে, খ প্রতিষ্ঠানের EPS ক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম। এর মূল কারণ লিভারেজের প্রতিকূল প্রভাব। প্রতিষ্ঠানটির সম্পত্তি থেকে আয় (return on asset) পেয়েছে ৬%, কিন্তু সুদ প্রদান করেছে ৯%। ফলে ৯% - ৬% = ৩% ঘাটতি হয়েছে। এই ঘাটতির কারণে ৳৭৫০ কর পূর্ব আয় বা ৳৩৭৫ কর পরবর্তী আয় কমেছে। ফলশ্রুতিতে ১৫% EPS কমেছে।

ঋণ ব্যবহারে সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় (২৫,০০০ × ৬%)	= ৳১,৫০০
(-) সুদ	২,২৫০
লিভারেজের প্রতিকূল প্রভাব (কর পূর্ব)	৳৭৫০
(-) ৫০% কর	৩৭৫
লিভারেজের প্রতিকূল প্রভাব (কর পরবর্তী)	৳৩৭৫

সারসংক্ষেপ :

- মূলধন কাঠামোতে স্থায়ী চার্জের তহবিল ব্যবহারই আর্থিক লিভারেজ।
- আর্থিক লিভারেজের প্রতিকূল ও অনুকূল উভয় ধরনের প্রভাব আছে। অনুকূল প্রভাবের কারণে শেয়ার প্রতি আয় (Earning per share, EPS) বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে প্রতিকূল প্রভাবের কারণে EPS কমে যায়।

পাঠ-৫.৪ মূলধন কাঠামো তত্ত্ব
Capital Structure Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মূলধন কাঠামো তত্ত্বের নাম বলতে পারবেন;
- মূলধন কাঠামো তত্ত্ব কী কী অনুমিত শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলতে পারবেন;
- মূলধন কাঠামো তত্ত্বে ব্যবহৃত প্রতীকগুলো বলতে পারবেন; এবং
- মূলধন কাঠামো তত্ত্বের সমীকরণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মূলধন কাঠামো তত্ত্ব

EPS -এর উপর আর্থিক লিভারেজের বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। একটি নির্ধারিত পর্যায় পর্যন্ত EBIT পরিবর্তন হলে আর্থিক লিভারেজের কারণে EPS -এ অনুরূপ পরিবর্তন বেশি মাত্রায় ঘটে কিন্তু আর্থিক লিভারেজ প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। এই অবস্থায় পর্যাপ্ত নগদানের অভাবে দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং সেই সাথে শেয়ারহোল্ডারদের আয়ের পরিবর্তন ঘটে। প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ফার্মের মূল্য সবচেয়ে বৃদ্ধি করা। এই মূল্য বৃদ্ধি করার কাজটি লিভারেজ বা মিশ্র অর্থায়ন বা সঠিক মূলধন কাঠামোর মাধ্যমে সম্ভব। এই মূলধন কাঠামো আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করে। তাই মূল্যের উপর মূলধন কাঠামোর প্রভাবের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা উচিত। মূলধন কাঠামো সাজানোর জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে এমন একটি মিশ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে খরচ সবচেয়ে কম হয় এবং তার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মূল্য সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। এই মূলধন কাঠামোকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলা হয়। সুতরাং, ঋণ ও ইক্যুইটির যে সমন্বয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে, তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বা optimum capital structure বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, লিভারেজ এবং কোম্পানির মূল্যের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

অনেকে বলেন, শেয়ারহোল্ডারদের সম্পদের উপর মিশ্র-অর্থায়ন বা ঋণ ও ইক্যুইটির সমন্বয়ের কোন প্রভাব নেই, তাই আর্থিক কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। অন্য কথায় বলা যায়, কাম্য আর্থিক কাঠামো বলে কিছুই নেই। কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে, মূলধন কাঠামো প্রত্যাশিত আয় বা মূলধন খরচ বা উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে কোম্পানির মূল্যকে প্রভাবিত করে। এটি সত্য যে অর্থায়ন মিশ্রণ মোট আয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে না। কারণ বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের উপর মোট আয় নির্ধারিত হয়। তবে এটি সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের আয়ের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত শেয়ারহোল্ডারদের আয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মূল্যকে প্রভাবিত করে। কিন্তু লিভারেজ মূলধন ব্যয়ের উপর প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মূল্যকে প্রভাবিত করে। এই পাঠে মূলধন কাঠামো তত্ত্ব বর্ণনার মাধ্যমে মূল্যায়নের দৃষ্টিতে লিভারেজ ও মূলধন খরচের সম্পর্ক বর্ণনা করা হবে। নিচে কতিপয় মূলধন কাঠামো তত্ত্বের নাম দেওয়া হলো :

১. নিট আয় তত্ত্ব (Net Income Approach)
২. নিট পরিচালনা আয় তত্ত্ব (Net Operating Income Approach)
৩. মডিগিলিয়ানি-মিলার তত্ত্ব (অনুমান) (Modigliani & Miller Hypothecis)
৪. প্রচলিত বা পুরাতন তত্ত্ব (Traditional approach)

মূলধন কাঠামো তত্ত্বগুলো কতিপয় অনুমিত শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমিত শর্তাবলী (assumptions) গুলি নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. প্রতিষ্ঠান মাত্র দুইটি উৎস থেকে অর্থায়ন করে : ঋণ এবং ইক্যুইটি।

২. করারোপের ব্যবস্থা নেই, অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে এটি পরিহার করা হয়েছে।
৩. লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত (dividend payout ratio) হলো ১০০%। অর্থাৎ আয়ের পুরোটাই শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বিতরণ করা হয়। কোন আয় অবন্টিত রাখার প্রয়োজন নেই।
৪. প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের পরিবর্তন হয় না। অন্য কথায়, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকে।
৫. প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অর্থায়ন ধ্রুব থাকে। প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রয় করে ঋণপত্রের অবলোপন করার মাধ্যমে লিভারেজের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারে। অথবা ঋণ করে ইক্যুইটি কমিয়ে লিভারেজের মাত্রা পরিবর্তন করতে পারে।
৬. পরিচালনা মুনাফা (operating profits) বা সুদ ও কর-পরবর্তী আয় (EBIT) বৃদ্ধি পায় এমন প্রত্যাশা করা হয়।
৭. একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত EBIT -এর ব্যাপারে সকল বিনিয়োগকারীর অনুমান (subjective probability distribution) একই।
৮. ব্যবসায়িক ঝুঁকি ধ্রুব এবং মূলধন কাঠামো ও আর্থিক ঝুঁকিতে এটি স্বতন্ত্র থাকে।
৯. প্রতিষ্ঠানের জীবনকাল অসীম (perpetual)।

উল্লিখিত অনুমিত শর্তগুলো ছাড়াও মূলধন কাঠামো তত্ত্বে নিচের প্রতীকগুলো ব্যবহার করা হবে।

S = সাধারণ শেয়ারের মোট বাজার মূল্য (Total market value of Common Share)
B = ঋণের মোট বাজারমূল্য (total market value of debt)
V = প্রতিষ্ঠানের মোট বাজার মূল্য (Total market value of the firm) (V=S+B)
I = সুদ বাবদ মোট পরিশোধ (total interest payments)
NI = সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য পর্যাপ্ত নিট আয় (net income available to common shareholders).

প্রতীকগুলো ব্যবহার করে কতিপয় বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করা হবে। নিচে বিষয়গুলি দেখানো হলো-

(১) ঋণের খরচ (cost of debt), $K_d = \frac{I}{B}$ ----------------- (৫.১)

ঋণের মূল্য (Value of debt), $B = \frac{I}{K_d}$ ---------------- (৫.২)

(২) ইক্যুইটি মূলধন ব্যয় (K_e) = $\frac{D_1}{P_0} + g$ ------------------- (৫.৩)

এখানে,

D_1 = নিট লভ্যাংশ (net dividend) ;
P_0 = শেয়ারের চলতি বাজার দর (current market price of shares) এবং
g = প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধির হার (expected growth rate)

অনুমিত শর্ত (iii) অনুযায়ী অবন্টিত আয় শূন্য। সুতরাং g = br, এখানে r = সাধারণ শেয়ারের উপর আয় হার (rate of return on equity share), b = আয় সংরক্ষণের হার (retention rate)। যেহেতু b = ০, সুতরাং g = ০, অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির হার শূন্য। এটি (vi) নং অনুমিত শর্তের অনুরূপ। যেহেতু g = ০, অতএব $D_1 = E_1$ হবে। অতএব K_e -এর মান নিচের মত হবে।

$$K_e = \frac{E_1}{P_0} + g = \frac{E_1}{P_0} + 0 = \frac{E_1}{P_0}$$ ------------------ (৫.৪)

এখানে E_1 = শেয়ার প্রতি আয় (earning per share)। ৫.৪ নং সমীকরণ প্রতিটি শেয়ারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এখন যদি লব ও হরকে বর্তমান শেয়ারের সংখ্যা (No. of outstanding shares), N দ্বারা গুণ করি এবং কোন আয়কর নাই এমন ধরে নেই, তাহলে আমরা পাই,

$$K_e = \frac{E_1 \times N}{P_0 \times N} = \frac{EBIT - I \text{ or } NI}{S} \text{ ----------------- } (৫.৫)$$

$$\text{বা, } K_e = \frac{\text{সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য অর্জিত আয় (Income available to equity holders)}}{\text{সাধারণ শেয়ারের মোট বাজার মূল্য (Total market value of equity shares)}}$$

সামগ্রিক মূলধন খরচ বা গুরুত্বপ্রদত্ত গড় মূলধন খরচ (Overall cost of capital or Weighted average cost of capital) :

$K_0 = W_1K_d + W_2K_e$ (W_1 এবং W_2 আপেক্ষিক গুরুত্ব)

$$\text{বা, } K_0 = \left(\frac{B}{V}\right)K_d + \left(\frac{S}{V}\right)K_e$$

$$\text{বা, } K_0 = \left(\frac{B}{B+S}\right)K_d + \left(\frac{S}{B+S}\right)K_e \text{ ---------------------- } (৫.৭)$$

$$\text{বা, } K_0 = \frac{I + NI}{V} = \frac{EBIT}{V} \text{ ---------------------------------- } (৫.৮)$$

উপরের ৫.৮ নং সমীকরণ থেকে প্রতিষ্ঠানের মূল্য নিচের সূত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা যায়-

$$V = \frac{EBIT}{K_0} \text{ --- } (৫.৯)$$

বিকল্পভাবে,

$$V = \frac{I}{K_d} + \frac{EBIT - I}{K_e} \text{ -------------------------------------- } (৫.১০)$$

আরো একটি উপায়ে ইক্যুইটি খরচ পরিমাপ করা যায়। নিচে এটি বর্ণনা করা হলো।
আমরা জানি,

$$K_0 = \left(\frac{B}{B+S}\right)K_d + \left(\frac{S}{B+S}\right)K_e \text{ ------------------------ } (৫.১১)$$

$$= K_d\left(\frac{B}{V}\right) + K_e\left(\frac{S}{V}\right) \text{ ------------------------------------ } (৫.১১.১)$$

$$= \frac{K_e - K_d\left(B/V\right)}{S/V} \text{ --------------------------------------- } (৫.১১.২)$$

আমরা জানি, V=B+S; অতএব ইক্যুইটি অনুপাত S/V নিচের মত করে প্রকাশ করা যায়।

$$\frac{S}{V} = \frac{S}{B+S} = 1 - \frac{B}{B+S} \text{ -------------------------------- } (৫.১১.৩)$$

৫.১১.২ নং সমীকরণে ৫.১১.৩ নং সমীকরণকে প্রতিস্থাপিত করে পাই,

$$K_e = K_0 - K_d\left(\frac{B}{B+S}\right) \div \left(1 - \frac{B}{B+S}\right)$$

$$= \left(\frac{K_0(B+S) - K_d.B}{B+S}\right) \div \left(\frac{B+S-B}{B+S}\right) \text{------------ (৫.১১.৪)}$$

$$= \frac{K_0B + K_0S - K_d.B}{B+S} \div \frac{S}{B+S} \text{-------------------- (৫.১১.৫)}$$

$$= \frac{K_0B + K_0S - K_d.B}{S} \text{------------------------------ (৫.১১.৬)}$$

$$\therefore K_e = K_0 + (K_0 - K_d) \div \left(\frac{B}{S}\right) \text{-------------------- (৫.১১.৭)}$$

সারসংক্ষেপ :

- ঋণ ও ইকুয়েটির যে সমন্বয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলা হয়।
- লিভারেজ মূলধন ব্যয়ের উপর প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মূল্যকে প্রভাবিত করে।
- মূলধন কাঠামো তত্ত্বের অনুমিত শর্ত অনুসারে ঝুঁকি ধ্রুব এবং মূলধন কাঠামো ও আর্থিক ঝুঁকিতে এটি স্বতন্ত্র থাকে।

পাঠ-৫.৫ নিট আয় তত্ত্ব
Net Income Approach

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত নিট আয় তত্ত্বের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- উদাহরণের সাহায্যে তত্ত্বটি প্রমাণ করতে পারবেন; এবং
- তত্ত্বটির মূল কথা লেখ চিত্রে প্রকাশ করতে পারবেন।

নিট আয় তত্ত্ব

নিট আয় তত্ত্বের মূল কথা হলো একটি প্রতিষ্ঠান মূলধন কাঠামোতে ঋণের অনুপাত বাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানের মূল্য বাড়াতে পারে বা সামগ্রিক মূলধন খরচ কমাতে পারে। এখানে সামগ্রিক মূলধন খরচ হলো ঋণের খরচ (cost of debt) এবং ইক্যুইটি মূলধন খরচ (cost of equity) -এর গুরুত্বপ্রদত্ত খরচ। মূলধন কাঠামোতে লিভারেজের পরিমাণ বাড়ালে গুরুত্বপ্রদত্ত খরচ কমে যাবে এবং প্রতিষ্ঠানের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং প্রতিটি সাধারণ শেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপভাবে বলা যায় মূলধন কাঠামোতে লিভারেজের পরিমাণ কমালে সামগ্রিক মূলধন খরচ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানের মূল্য কমে যায়। এই তত্ত্বটি নিচের অনুমিত শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ

১. কোন করারোপের ব্যবস্থা নেই।

২. ঋণের খরচ ইক্যুইটি মূলধনের খরচের চেয়ে কম, অর্থাৎ $K_d < K_e$

৩. ইক্যুইটি খরচ, K_e এবং ঋণের খরচ, K_d লিভারেজ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ধ্রুব থাকে।

৩নং অনুমিত শর্তের সূত্র ধরে বলা যায়, যদি K_e এবং K_d ধ্রুব হয় তাহলে ঋণ বাড়িয়ে শেয়ারহোল্ডারদের আয় বাড়ানো গেলে প্রতিষ্ঠানের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে সামগ্রিক মূলধন খরচ, K_0 কমে যাবে। আমরা জানি, নিচের সমীকরণ থেকে K_0 পরিমাপ করা যায়।

$$K_0 = \frac{I + NI}{V} = \frac{EBIT}{V} \text{------------------------ (৫.১২)}$$

এখানে,

I = মোট প্রদত্ত সুদ

NI = ইক্যুইটি হোল্ডারদের আয়

V = প্রতিষ্ঠানের মোট বাজার মূল্য

এই সমীকরণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, প্রতিবছর EBIT -এর পরিমাণ যদি ধ্রুব থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সামগ্রিক মূলধন খরচ কমবে এবং বিপরীত ক্রমে এই নিয়মের উল্টোটি হবে।

নিচের সূত্রের সাহায্যেও সামগ্রিক মূলধন খরচ নির্ণয় করা যায়-

$$K_0 = K_e - (K_e - K_d)\frac{B}{S} \text{ ------------------------ (৫.১৩)}$$

এখানে,

K_0 = সামগ্রিক মূলধন খরচ

K_e = সাধারণ শেয়ার (Equity) মূলধনের খরচ

K_d = ঋণ মূলধনের খরচ

B = ঋণের মোট বাজার মূল্য

S = সাধারণ শেয়ারের মোট বাজার মূল্য

অনুমিত শর্ত সাপেক্ষে সমীকরণ ৫.১৩ এ K_e ও K_d ধ্রুব এবং $K_d < K_e$ । অতএব B/S এর হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে K_0 এর মান হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে। এই সমীকরণ থেকে আরও বুঝা যায় যে, প্রতিষ্ঠান যদি কোন ঋণ ব্যবহার না করে, সামগ্রিক মূলধন খরচ (K_0) সাধারণ শেয়ার মূলধন খরচ (K_e) এর সমান হবে।

এবার আসুন নিট আয় তত্বটির যৌক্তিকতা প্রমাণ করি।

উদাহরণ

ধরুন, একটি কোম্পানির প্রত্যাশিত নিট পরিচালনা আয়, অর্থাৎ সুদ ও কর পূর্ববর্তী আয়, EBIT = ৳২,০০,০০০; ইক্যুইটি খরচ, K_e = ১০% এবং ৫% সুদে ঋণের পরিমাণ = ৳১০,০০,০০০। নিট আয় তত্ত্ব (NI approach) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল্য নিচের টেবিলে দেখানো হলো-

টেবিল-৫.১ : প্রতিষ্ঠানের মূল্য (নিট আয় তত্ত্ব)

নিট পরিচালনা আয়, EBIT	৳২,০০,০০০
বাদ, মোট ঋণ খরচ, $I = K_d.S$,= (১০,০০,০০০×০.০৫)	৫০,০০০
নিট আয় (NI), শেয়ারহোল্ডারদের	৳১,৫০,০০০
ইক্যুইটির বাজারমূল্য, S(৳১,৫০,০০০ ÷ ০.১০)	৳১৫,০০,০০০
ঋণের বাজারমূল্য, B(৳৫০,০০০ ÷ ০.০৫)	১০,০০,০০০
প্রতিষ্ঠানের বাজার মূল্য, V = S+B	৳২৫,০০,০০০

$$\therefore K_0 = \frac{EBIT}{V} = \frac{2,00,000}{25,00,000} = 0.08 \text{ hj } 8\%$$

অথবা, $K_0 = K_d\left(\frac{B}{V}\right) + K_e\left(\frac{S}{V}\right)$

$$= 0.05\left(\frac{10,00,000}{25,00,000}\right) + 0.10\left(\frac{15,00,000}{25,00,000}\right)$$

= ০.০২ + ০.০৬

=০.০৮ = ৮%

এবার ধরুন, এই প্রতিষ্ঠানটি ৳১০,০০,০০০ এর পরিবর্তে ৳১২,০০,০০০ ঋণ ব্যবহার করবে। তাহলে নিচের টেবিলটির দিকে লক্ষ্য করুন।

টেবিল ৫.২ : প্রতিষ্ঠানের মূল্য (নিট আয় তত্ত্ব)

নিট পরিচালনা আয়, EBIT	৳২,০০,০০০
বাদ, মোট ঋণ খরচ, $I = K_d .S$ = (১২,০০,০০০×.০৫)	৬০,০০০
নিট আয় (NI), শেয়ারহোল্ডারদের	৳১,৪০,০০০
ইক্যুইটির বাজারমূল্য, S(৳১,৪০,০০০ /০.১০) ঋণের বাজারমূল্য, B(৳৬০,০০০ /০.০৫)	৳১৪,০০,০০০ ১২,০০,০০০
প্রতিষ্ঠানের বাজার মূল্য, V = S + B	৳২৬,০০,০০০

$$\therefore K_0 = \frac{EBIT}{V} = \frac{2,00,000}{26,00,000} = 0.077 \text{ hj } 7.7\%$$

অথবা, $K_0 = K_d\left(\frac{B}{V}\right) + K_e\left(\frac{S}{V}\right)$

$$= 0.05\left(\frac{10,00,000}{25,00,000}\right) + 0.10\left(\frac{15,00,000}{25,00,000}\right)$$

= ০.০২৩ + ০.০৫৪

= ০.০৭৭ = ৭.৭%

সুতরাং উপরের টেবিল দু'টি বিশেগুষণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রতিষ্ঠান ঋণ বাড়িয়ে মূলধন খরচ, K_0 কমাতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের মূল্য বাড়াতে পারে।

এবার ৫.৩ নং টেবিলটি লক্ষ্য করুন।

টেবিল-৫.৩ : নিট আয় তত্ত্বের আওতায় মূল্য ও মূলধন খরচের উপর লিভারেজের প্রভাব

লিভারেজ =B/V	০%	৪০%	৪৬.১৫%	১০০%
EBIT	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
(-) Interest	০	৫০,০০০	৬০,০০০	২,০০,০০০
NI	২,০০,০০০	১,৫০,০০০	১,৪০,০০০	-
K_d	০.০৫	০.০৫	০.০৫	০.০৫
K_e	০.১০	০.১০	০.১০	০.১০
S	২০,০০,০০০	১৫,০০,০০০	১৪,০০,০০০	০
$B = Int \div K_d$	০	১০,০০,০০০	১২,০০,০০০	৪০,০০,০০০
V=S+B	২০,০০,০০০	২৫,০০,০০০	২৬,০০,০০০	৪০,০০,০০০
K_0 = EBIT/V	০.১০	০.০৮	৭.৭	০.০৫

এই টেবিল (৫.৩) এর তথ্যগুলো লেখ চিত্রে প্রদর্শন করা হলে নিচের চিত্রটি পাওয়া যাবে।

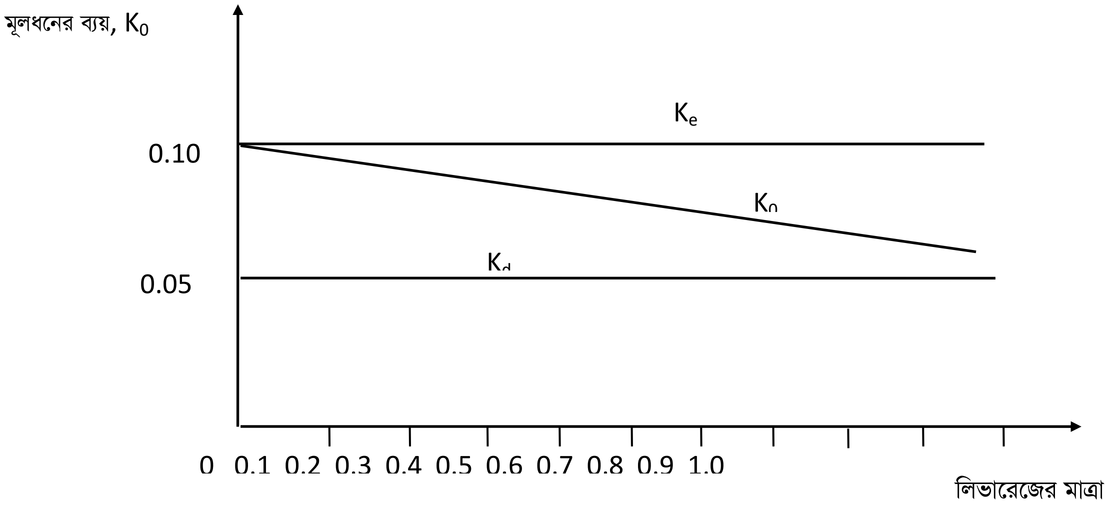

চিত্র- ৫.১ : নিট আয় তত্ত্ব অনুযায়ী মূলধন খরচের উপর লিভারেজের প্রভাব

চিত্র থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মূলধন কাঠামোতে ঋণের অনুপাত বাড়ালে মূলধন ব্যয়, K_0 কমে যায়।

সারসংক্ষেপ :

- মূলধন কাঠামোতে লিভারেজের পরিমাণ কমালে সামগ্রিক মূলধন খরচ বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিষ্ঠানের মূল্য কমে যায় ।
- যদি K_e এবং K_d ধ্রুব হয় তাহলে ঋণ বাড়িয়ে শেয়ারহোল্ডারদের আয় বাড়ানো গেলে প্রতিষ্ঠানের মূল্য বৃদ্ধি পাবে।
- প্রতিষ্ঠান যদি কোন ঋণ ব্যবহার না করে, সামগ্রিক মূলধন খরচ,(K_0) সাধারণ শেয়ার মূলধন খরচ, (K_e) এর সমান হবে ।
- প্রতিষ্ঠান ঋণ বাড়িয়ে মূলধন খরচ, K_0 কমাতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের মূল্য বাড়াতে পারে।

পাঠ-৫.৬ নীট পরিচালনা আয় তত্ত্ব

Net Operating Income Approach

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নীট পরিচালনা আয় তত্ত্বের অনুমিত শর্তাবলী উল্লেখ করতে পারবেন;
- নীট পরিচালনা আয় তত্ত্বের মূল কথা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- উদাহরণের সাহায্যে নিট পরিচালনা আয় তত্ত্বটি বর্ণনা করতে পারবেন।

নীট পরিচালনা আয় তত্ত্ব

নিট পরিচালনা আয় তত্ত্বটির প্রবর্তক হলেন Durand । এটিকে পরবর্তী আলোচনার NOI তত্ত্ব বলা হবে। এই তত্ত্বটি নিট আয় (NI) তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই তত্ত্বটির মূল বক্তব্য হলো, একটি প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়। মূলধন কাঠামোতে মূলধন খরচ স্বতন্ত্র হওয়ায় লিভারেজের কোন পরিবর্তন হলে প্রতিষ্ঠানের মূল্যে ও শেয়ারের বাজার মূল্যে কোন প্রভাব পড়ে না।

এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হল :

১. সামগ্রিক মূলধন খরচ, K_0 ধ্রুব থাকে

NOI তত্ত্বে সামগ্রিক মূলধন খরচ যে কোন মাত্রার লিভারেজের জন্য ধ্রুব থাকে বলে অনুমান করা হয়। প্রতিষ্ঠানের মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ EBIT -এর জন্য নিচের সূত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

$$V = \frac{EBIT}{K_0}$$

অন্যভাবে এই কথাটিকে বলা যায় যে, শেয়ারের বাজার মূল্যই প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করে। সুতরাং বলা যায় যে, ঋণ ও ইক্যুইটিকে পরস্পর পৃথকভাবে বিবেচনা করা হলেও এটি প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২. ইক্যুইটির অবশেষ মূল্য (Residual Value)

প্রতিষ্ঠানে ঋণ ও ইক্যুইটি ব্যবহার করা হলেও এটির একটি মূল্য অবশ্যই থাকবে। সেই অনুযায়ী ইক্যুইটিরও একটি পৃথক অবশেষ মূল্য (residual value) থাকবে। ইক্যুইটির অবশেষ মূল্য প্রতিষ্ঠানের মোট মূল্য (total value), V থেকে ঋণের মোট মূল্য (total value of debt), B কে বাদ দিয়ে নির্ণয় করা হয়। ইক্যুইটির অবশেষ মূল্যটিই হবে ইক্যুইটির বাজার মূল্য (market value of equity) ।

অতএব ইক্যুইটির বাজার মূল্য (S) = V- B

৩. মূলধন খরচের পরিবর্তন

ইক্যুইটির মূলধন খরচ (K_e) লিভারেজের মাত্রার সাথে বৃদ্ধি পায়। ফলে মূলধন কাঠামোতে ইক্যুইটির তুলনায় ঋণের মাত্রা বাড়ানোর সাথে সাথে সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের আর্থিক ঝুঁকি (financial risk) বেড়ে যায়। শেয়ারহোল্ডারগণ এই ঝুঁকির মূল্য হিসেবে তাদের বিনিয়োগের উপর অধিক আয় (rate of return) পাওয়ার প্রত্যাশা করবে। এই অবস্থায় মূলধন খরচ,

$K_e = K_0 + (K_0 - K_d)(B/S)$ হবে।

৪. ঋণের খরচ

ঋণের খরচের দু'টি অংশ আছে। যেমন- (ক) ব্যক্ত খরচ (explicit cost), এই খরচটি সুদের হার (rate of interest) -এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এখানে এমন অনুমান করা হয় যে, একটি নির্দিষ্ট সুদে প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণ করে লিভারেজের মাত্রা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং মূলধন কাঠামোতে ঋণের অনুপাত বাড়ানোর ফলে ঋণদাতার (lender) কোন আর্থিক ঝুঁকি বাড়ে না এবং সে অতিরিক্ত সুদ ধার্য করে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় না। এবং (খ) অব্যক্ত খরচ (implicit or hidden cost)। মূলধন কাঠামোতে লিভারেজের মাত্রা বাড়ানোর ফলে ইক্যুইটির খরচ, K_e ও বেড়ে যায়। কারণ এতে ঝুঁকি বেড়ে যায়। ঝুঁকি নেওয়ার কারণে বিনিয়োগকারী ঝুঁকির একটি প্রিমিয়াম পাওয়ার জন্য প্রত্যাশা করবেন। তাই ইক্যুইটি মূলধন খরচ, K_e -এর একটি অংশ ঋণের একটি অব্যক্ত খরচ, K_e -এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

আমরা যদি ঋণের খরচ শুধু ব্যক্ত খরচ, অর্থাৎ সুদের হারের মাধ্যমে নির্ধারণ করি তাহলে ইক্যুইটির চেয়ে ঋণের খরচ দৃশ্যত কম মনে হবে। কিন্তু যখন অব্যক্ত খরচকে বিবেচনায় ধরি তখন ঋণের খরচ এবং ইক্যুইটির খরচ পরস্পর একই হবে। এটিই মূলতঃ NOI তত্ত্বের মূল কথা।

৫. কাম্য মূলধন কাঠামো

এবার আসুন, NOI তত্ত্ব অনুযায়ী কাম্য মূলধন কাঠামো কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল্য লিভারেজের মাত্রার উপর নির্ভর করে না, এটি ধ্রুব (constant) থাকবে। ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত (debt-equity ratio) পরিবর্তনে শেয়ারের বাজার মূল্যের পরিবর্তন হয় না। সুতরাং বলা যায় যে, কাম্য মূলধন কাঠামো বলে কিছুই নেই। তাই NOI তত্ত্ব অনুযায়ী যে কোন মূলধন কাঠামোই কাম্য আর্থিক কাঠামো হিসাবে বিবেচিত হয়।

NOI তত্ত্বটি একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করলে কেমন হয়- তাহলে আসুন তাই করি।

উদাহরণ

ধরুন, একটি কোম্পানির পরিচালনা আয় = ৳৫০,০০০ ; ঋণের খরচ = ১০% ; ঋণের পরিমাণ = ৳২,০০,০০০। সামগ্রিক মূলধন খরচ = ১২.৫% হলে প্রতিষ্ঠানের মূল্য এবং ইক্যুইটি খরচ কত হবে?

সমাধান

নিচের টেবিলটি লক্ষ্য করুন
টেবিল- ক: প্রতিষ্ঠানের মূল্য (NOI তত্ত্ব)

প্রতিষ্ঠানের মূল্য (NOI তত্ত্ব)	
নিট পরিচালনা আয় (EBIT)	৳৫০,০০০
সামগ্রিক মূলধন ব্যয়, K_0	০.১২৫
প্রতিষ্ঠানের মোট মূল্য (V) $= \frac{EBIT}{K_0}$	৳৪,০০,০০০
ঋণের মোট মূল্য (B)	৳২,০০,০০০
ইক্যুইটির মোট মূল্য (S) = (V - B)	৳২,০০,০০০

ইক্যুইটি খরচ, $K_e = \dfrac{EBIT - I}{V - B}$

$$= \frac{\text{ইক্যুইটিহোল্ডারদের আয়}}{\text{ইক্যুইটি শেয়ারের বাজার মূল্য}}$$

$$K_e = \frac{\$50{,}000 - \$20{,}000}{\$2{,}00{,}000} = \frac{\$30{,}000}{\$2{,}00{,}000} = 0.15 \text{ h¡ } 15\%$$

অন্যভাবে, $K_e = K_0 + (K_0 - K_d)\ (B/S)$

$$= ১২.৫\% + (১২.৫\% - ১০.০\%)\left(\frac{\$2{,}00{,}000}{\$2{,}00{,}000}\right)$$

$$= ১২.৫\% + ২.৫\% = ১৫\%$$

NOI তত্ত্বটির সত্যতা প্রমাণের জন্য গুরুত্বপ্রদত্ত মূলধন খরচের ব্যবহার করা যাক।

$$K_0 = K_d + (B/V) + K_e\ (S/V)$$

$$= 10\%\left(\frac{\$2{,}00{,}000}{4{,}00{,}000}\right) + 15\%\left(\frac{\$2{,}00{,}000}{\$4{,}00{,}000}\right)$$

$$= (৫\% + ৭.৫\%) = ১২.৫\%$$

লিভারেজের প্রভাব দেখানোর জন্য ধরে নিন প্রতিষ্ঠানটি ঋণের পরিমাণ ৳২,০০,০০০/- থেকে ৳৩,০০,০০০/- তে বৃদ্ধি করেছে এবং এই ঋণের অর্থ ইক্যুইটি শেয়ার পুনঃক্রয় (re-purchase) -এর জন্য ব্যবহার করেছে। এতে প্রতিষ্ঠানের মূল্য = ৳৪,০০,০০০ টাকা অপরিবর্তিত থাকবে এবং ইক্যুইটির খরচ বেড়ে গিয়ে ২০% হবে। (টেবিল-খ)

টেবিল- খঃ প্রতিষ্ঠানের মূল্য (NOI তত্ত্ব)

প্রতিষ্ঠানের মূল্য (NOI তত্ত্ব)	
নিট পরিচালনা আয় (EBIT)	৳৫০,০০০
সামগ্রিক মূলধন খরচ K_0	০.১২৫
প্রতিষ্ঠানের মোট বাজার মূল্য (V) $= \frac{EBIT}{K_0}$	৳৪,০০,০০০
ঋণের মোট মূল্য (B)	৳৩,০০,০০০
ইক্যুইটির মোট বাজার মূল্য (S) = (V - B)	৳১,০০,০০০

$$K_e = \frac{\$50{,}000 - \$30{,}000}{\$1{,}00{,}000} = \frac{\$20{,}000}{\$1{,}00{,}000} = 20\%$$

অন্যভাবে,

$$K_e = ১২.৫\% + (১২.৫\% - ১০.০\%)\left(\frac{\$3{,}00{,}000}{\$1{,}00{,}000}\right)$$

$$= ১২.৫\% + ৭.৫\% = ২০\%$$

$$K_0 = ১০\%\left(\frac{\$3{,}00{,}000}{\$4{,}00{,}000}\right) + ২০\%\left(\frac{\$1{,}00{,}000}{\$4{,}00{,}000}\right)$$

$$= ৭.৫\% + ৫.০\% = ১২.৫\%$$

আবার ধরুন, প্রতিষ্ঠানটি ৳১,০০,০০০ এর ঋণ পরিশোধ করে ৳১,০০,০০০ -এর ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করল। এতে প্রতিষ্ঠানের মূল্য ৳৪,০০,০০০ ঠিক থাকবে এবং ইক্যুইটির খরচ নেমে গিয়ে ১৩.৩% হবে। (টেবিল-গ)

টেবিল- গ : প্রতিষ্ঠানের মূল্য (NOI তত্ত্ব)

প্রতিষ্ঠানের মূল্য (NOI তত্ত্ব)	
নিট পরিচালনা আয় (EBIT)	৳৫০,০০০
সামগ্রিক মূলধন খরচ K_0	০.১২৫
প্রতিষ্ঠানের মোট বাজার মূল্য (V) $= \frac{EBIT}{K_0}$	৳৪,০০,০০০
ঋণের মোট মূল্য (B)	৳১,০০,০০০
ইক্যুইটির মোট বাজার মূল্য (S) = (V - B)	৳৩,০০,০০০

$$K_e = \frac{\$50{,}000 - \$10{,}000}{\$3{,}00{,}000} = \frac{\$40{,}000}{\$3{,}00{,}000} = 13.33\% \text{ (f ü)}$$

অন্যভাবে,

$$K_e = ১২.৫\% + (১২.৫\% - ১০.০\%)\left(\frac{\$1{,}00{,}000}{\$3{,}00{,}000}\right)$$

$$= ১২.৫\% + ০.৮৩\% = ১৩.৩৩ \text{ (প্রায়)}$$

$$K_0 = ১০\% \left(\frac{\$1{,}00{,}000}{\$4{,}00{,}000}\right) + ১৩.৩৩\%$$

$$= ২.৫\% + ৫১০\% = ১২.৫\% \left(\frac{\$3{,}00{,}000}{\$4{,}00{,}000}\right)$$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, লিভারেজের ০.৫০ থেকে ০.৭৫ বৃদ্ধির ফলে মূলধন খরচের ১৫% - ২০% বৃদ্ধি হয়েছে। আবার মূলধন খরচের ১৫% থেকে ১৩.৩৩% কমে যাওয়ার ফলে লিভারেজ কমেছে ০.৫০ - ০.২৫ । অথচ সামগ্রিক মূলধন খরচ (K_0) অপরিবর্তিত (১২.৫০%) রয়ে গেছে।

সারসংক্ষেপ :

- NOI তত্ত্বে সামগ্রিক মূলধন খরচ যে কোন মাত্রার লিভারেজের জন্য ধ্রুব থাকে বলে অনুমান করা হয় ।
- NOI তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল্য লিভারেজের মাত্রার উপর নির্ভর করে না, এটি ধ্রুব থাকবে ।

পাঠ-৫.৭ কাম্য মূলধন কাঠামো
Optimum Capital Structure

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কাম্য মূলধন কাঠামো সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন; এবং
- কাম্য মূলধন কাঠামো লেখ চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারবেন ।

কাম্য মূলধন কাঠামো

প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোতে ঋণ এবং ইক্যুইটির একটি অনুপাত থাকে। এই ঋণের খরচ এবং ইক্যুইটির খরচ মিলে মূলধন কাঠামোর খরচ নির্ধারিত হয়। এই খরচটিকে সামগ্রিক মূলধন খরচ বলে। যে মূলধন কাঠামোতে সামগ্রিক মূলধন খরচ সর্বনিম্ন হয়, তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলে।

নিচের টেবিলটি লক্ষ্য করুন

	মূলধন খরচ (কর কর্তনের পর)	গুরুত্ব	গুরুত্বপ্রদত্ত মূলধন খরচ
ঋণ	৬.৩৪%	৩০%	১.৯০%
অগ্রাধিকার মূলধন	১০.৯৪%	১০%	১.০৯%
ইক্যুইটি (সংরক্ষিত আয়)	১২.০০%	৬০%	৭.২০%
সামগ্রিক বা গুরুত্ব প্রদত্ত মূলধন খরচ			১০.১৯%

এখন প্রশ্ন হলো, মূলধন কাঠামোতে ঋণ, অগ্রাধিকার মূলধন এবং ইক্যুইটি মূলধন কী অনুপাতে অর্থায়ন করা উচিত? ঋণের খরচ সবচেয়ে কম, কিন্তু ঋণ ব্যবহারের একটি যুক্তিসঙ্গত সীমা রয়েছে। কারণ ঋণের সাথে ঝুঁকি জড়িত। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ঋণের খরচ কম হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যবহার বাড়ানো যায় না কেন? উত্তরটি হলো ঋণের পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং সেই ঝুঁকির খেসারত হিসেবে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে, অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হতে পারে।

ধরুন, আপনি আপনার নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থায়ন শুরু করছেন এবং বেছে নিয়েছেন তিনটি বিকল্প মূলধন কাঠামো। দেখানোর সুবিধার্থে মূলধন কাঠামোতে শুধু ঋণ ও ইক্যুইটির অনুপাত ব্যবহার করা হলো। মূলধন কাঠামোতে ঋণ ও ইক্যুইটির মিশ্রণ পরিবর্তন করা হলে উপাদানগুলোর খরচও পরিবর্তন হয়।

আর্থিক পরিকল্পনা-ক	**খরচ (কর কর্তনের পর)**	**গুরুত্ব**	**গুরুত্বপ্রদত্ত খরচ**
ঋণ	৬.৫%	২০%	১.৩%
ইক্যুইটি	১২.০	৮০%	৯.৬
		∴ WACC =	১০.৯%
আর্থিক পরিকল্পনা-খ			
ঋণ	৭.০%	৪০%	২.৮%
ইক্যুইটি	১২.৫%	৬০%	৭.৫

		∴ WACC =	১০.৩%
আর্থিক পরিকল্পনা-গ			
ঋণ	৯.০%	৬০%	৫.৪%
ইক্যুইটি	১৫.০%	৪০%	৬.০%
		∴ WACC =	১১.৪%

এখানে WACC = Weighted average cost of capital (গুরুত্বপ্রদত্ত গড় মূলধন খরচ)

উপরের পরিকল্পনাগুলো পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট যে, প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক পর্যায়ে ঋণ ব্যবহার করে সামগ্রিক মূলধন খরচ কমাতে পারলেও পরবর্তী পর্যায়ে তা বেড়ে যায়। সুতরাং তিনটি আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে খ পরিকল্পনাটিকে কাম্য মূলধন কাঠামো হিসেবে গণ্য করা যায়। পুরাতন বা প্রথাগত আর্থিক তত্ত্বগুলো ঋণ-ইক্যুইটি মিশ্রণের গুরুত্বপ্রদত্ত খরচকে U আকারের রেখা দ্বারা প্রদর্শন করেছে। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন

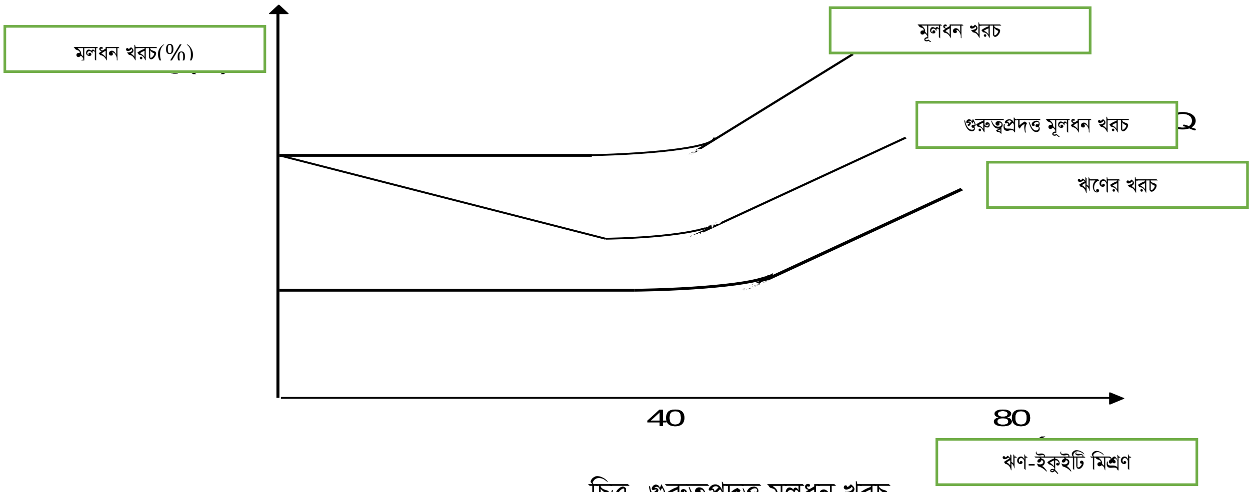

চিত্র- গুরুত্বপ্রদত্ত মূলধন খরচ

চিত্র থেকে স্পষ্ট যে, ৪০% ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাতের খরচ (১০.৩%) সবচেয়ে কম। সুতরাং এই মিশ্রনটিকেই কাম্য মূলধন কাঠামো বলা হবে। বিনিয়োগকারী এবং ঋণদাতাগণ মূলধন কাঠামোতে ৩০ - ৫০% ঋণের ব্যবহার পছন্দ করেন। এই অনুপাতটি প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি গ্রহণের উপর নির্ভর করে। কাম্য মূলধন কাঠামো অর্জনের জন্য বর্তমান মূলধন কাঠামোর সাম্প্রতিক অবস্থা সূক্ষ্মভাবে বিচার -বিশ্লেষণ করতে হয়। এছাড়া নতুন করে অর্থায়নের খরচগুলোও বিবেচনা করে নিতে হবে।

সারসংক্ষেপ :

- যে মূলধন কাঠামোর সামগ্রিক মূলধন খরচ সর্বনিম্ন হয় তাকে কাম্য মূলধন কাঠামো বলা হয়।
- মূলধন কাঠামোর উপাদানগুলোর মধ্যে ঋণের খরচ সবচেয়ে কম।
- মূলধন কাঠামোতে একটি যুক্তিসঙ্গত সীমা পর্যন্ত ঋণ ব্যবহার করা যায়। এই সীমা ৩০-৫০% হওয়া উচিত।
- গুরুত্বপ্রদত্ত মূলধন খরচ রেখা U আকৃতির হয়।

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

১. আপনার দৃষ্টিতে একটি মূলধন কাঠামোর বৈশিষ্ট্য কী হওয়া উচিত?

২. 'কোম্পানির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সাধারণ শেয়ার মূলধনের চেয়ে ঋণ ও অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মূলধনের সংযোজন বেশি পছন্দ করেন।' - যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

৩. একটি প্রতিষ্ঠানে ১০০ টাকা মূল্যের ১,০০০ টি শেয়ার আছে। প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য আয়ের হার ৮%। প্রতিষ্ঠানটি অতিরিক্ত ৫০,০০০ টাকা অর্থায়ন করতে চায়। এই অর্থায়ন ১০০ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ার ইস্যু করে কিংবা ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে করা সম্ভব। ঋণের সুদ ৬% হলে কিংবা ১০% হলে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রতি আয় (EPS) এর উপর কী প্রভাব পড়বে এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত কী হবে? মনে করুন, কর হার ৫০%

৪. 'EPS নির্ণায়কটি অর্থায়ন সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদী বিষয় বিবেচনা করে না।' নির্ণায়কটি ব্যবহারে সুবিধা অসুবিধার আলোকে উদাহরণসহ মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করুন।

৫. 'অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণ শেয়ারহোল্ডারদের ঝুঁকি বাড়ায় ফলে সাধারণ শেয়ারের মূলধন খরচ বেড়ে যায়।' - উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. 'প্রতিষ্ঠান যত কম ঋণ মূলধন সংগ্রহ করবে, ততই মূলধন কাঠামোর নমনীয়তা বৃদ্ধি পাবে।' এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করুন এবং আপনার মন্তব্য দিন।

৭. আর্থিক লিভারেজ কখন প্রতিকূল হয়? ব্যাখ্যা করুন।

৮. আর্থিক লিভরেজ কখন অনুকূল হয়? ব্যাখ্যা করুন।

৯. মূলধন কাঠামো তত্ত্বের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন।

১০. মূলধন কাঠামো তত্ত্বের অনুমিত শর্তাবলী বর্ণনা করুন।

১১. মূলধন কাঠামো তত্ত্বে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহের উল্লেখ করুন।

১২. প্রমাণ করুন, $K_e = K_0 + (K_0 - K_d) \div \left(\frac{B}{S}\right)$

১৩. ধরুন একটি কোম্পানির সুদ ও কর পূর্ববর্তী আয়, EBIT = ৳২,২২,০০০। ইক্যুইটি খরচ, K_e=১১% এবং ৬% সুদে ঋণের পরিমাণ = ৳১২,০০,০০০ এবং ৳১৪,০০,০০০ এর ক্ষেত্রে বিশেগুষণ করে দেখান যে, কোম্পানি ঋণ বাড়িয়ে মূলধন খরচ, K_0 কমাতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের মূল্য বাড়াতে পারে।

১৪. নিট আয় তত্ত্বের অনুমিত শর্তাবলী বর্ণনা করুন।

১৫. নিট আয় তত্ত্বের মূল বক্তব্য বর্ণনা করুন।

১৬. NOI তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।

১৭. NOI তত্ত্বটি বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে সমালোচনা করুন।

১৮. একটি কোম্পানির ক্ষেত্রে কখন $K_e = K_d$ হবে? কোন কোন ক্ষেত্রে $K_e < K_d$ অথবা $K_e > K_d$ হতে পারে

১৯. একটি কোম্পানির সুদ ও কর পূর্ববর্তী আয় ৩,০০,০০০ টাকা, K_e = ১২% এবং ৮% সুদে ঋণের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা হলে, নিট আয় তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল্য এবং প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক মূলধন খরচ নির্ণয় করুন।

২০. 'NOI তত্ত্বে দেখা যায় যে, অতিরিক্ত ঋণ মূলধনের কারণে যে ঝুঁকির বৃদ্ধি ঘটে তা ইক্যুইটি মূলধন খরচকে বৃদ্ধি করে। ফলে সামগ্রিক মূলধন খরচ একটি নির্দিষ্ট EBIT তে ধ্রুব (Constant) থাকে।' -ব্যাখ্যা করুন।

২১. মনে করুন, একটি কোম্পানির পরিচালনা আয় ২,০০,০০০ টাকা, ঋণের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকা, ঋণের খরচ ৮% এবং সামগ্রিক মূলধন খরচ ১০%। প্রতিষ্ঠানের মূল্য ও ইক্যুইটি খরচ নির্ণয় করুন। আবার ধরুন, (ক) কোম্পানি আরও ১,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ইক্যুইটি শেয়ার ক্রয়ে ব্যবহার করেছে কিংবা (খ) ২,০০,০০০ টাকা ঋণ পরিশোধ করে সমমূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার ইস্যু করলো। এই দু'টি পরিস্থিতি বিবেচনা করে NOI তত্ত্বটির সত্যতা যাচাই করুন।